১৮৫৮ অব্দের জুলাই মাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের রত্নাবলী-নাটক বেলগেছে নাট্যশালায় সাড়ম্বরে অভিনীত দেখিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-৭৩) বাঙ্গালা নাটক লিখিতে অনুপ্রাণিত হন। এই অনুপ্রেরণার প্রথম ফল 'শর্মিষ্ঠা নাটক' (১৮৫৯, দ্বি-স ১২৭০ সাল, তৃ-স ১২৭৬ সাল)। শর্মিষ্ঠা বাহির হইবার দুই-এক মাসের মধ্যেই 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' এবং তাহার অনতিবিলম্বে 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুইটি বাহির হইল। ১৮৬০ অব্দের গোড়ার দিকে(?) প্রকাশিত হইল 'পদ্মাবতী-নাটক'। পদ্মাবতী নাটক রচনার পর মধুসূদন 'সুভদ্রা' নামে একটি নাট্যকাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলিকে লেখা একটি চিঠিতে জানা যায় যে এই নাট্যকাব্যের দুইটি অঙ্ক লেখা হইয়া গিয়াছিল।[৫১] এ রচনাটি সমাপ্ত হয় নাই। ১৮৬১ অব্দের আগেই মধুসূদনের তৃতীয় নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' লেখা হইয়াছিল। ইহার পর মধুসূদন নাট্যরচনায় হাত দিয়াছিলেন একেবারে শেষ জীবনে। মধুসূদন 'মায়া-কানন' (১৮৭৪) সমাপ্ত করিয়াছিলেন কিন্তু মুদ্রিত দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। মায়া-কাননের প্রকাশকের বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায় যে মধুসূদন 'বিষ না ধনুর্গুণ' নামে আর একটি নাটক-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের চারটি নাটকই পঞ্চাঙ্ক।

শর্মিষ্ঠা নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম দস্তুরমতো নাটক। ইহার পূর্বে যে সকল নাটক প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলির প্লট সুকল্পিত নয়, এবং অধিকাংশই সংলগ্ন-অসংলগ্ন কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টিমাত্র। গুণের মধ্যে এইটুকু যে সমাজদোষঘটিত নাটকগুলি অতিরঞ্জন সত্ত্বেও বাস্তবজীবনের প্রতিফলনবঞ্চিত নয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে বস্তু-অনুগতির প্রথম আমদানি এই নাটক-প্রহসনগুলির মধ্য দিয়াই।

সমসাময়িক যাত্রাগানের কদর্যতা ও নাটকের দুরবস্থা দেখিয়া মধুসূদন নাটক লিখিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনা-কবিতায় তাই তিনি লিখিয়াছিলেন,

শুন গো ভারতভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম-ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

Scanned with CamScanner

কোথায় বাল্মীকি ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো জাগো, বিভুস্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয় নিচয়।[৫২]

বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজিতে গিয়া স্বভাবতই কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলার প্রতি মধুসূদনের মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। শকুন্তলার একটি শ্লোকে মধুসূদন প্রকল্পিত নাটকের কাহিনীসূত্রের সন্ধান পাইলেন। শ্লোকটি পতিগৃহগমনোন্মুখী শকুন্তলার প্রতি কণ্বের আশীর্বচন।

যযাতেরিব শর্মিষ্ঠা ভর্ত্তুর্বহুমতা ভব
সুতং ত্বমপি সম্রাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ॥[৫৩]

শর্মিষ্ঠার ঘটনাসংস্থানেও কালিদাসের নাটকের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। শর্মিষ্ঠার প্রণয়লীলার আয়োজন শকুন্তলার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পুরু যে-অবস্থায় অজ্ঞাতসারে দেবযানীর কাছে আত্মপরিচয় দিয়াছিল তাহা শকুন্তলার মতো। দেবযানীর সখীও শকুন্তলার সখীদ্বয়ের আদর্শে গড়া। শর্মিষ্ঠার বিদূষক শকুন্তলার মাধব্যের অনুকরণ। এমন কি শকুন্তলার কোন কোন ছত্রের অনুবাদ বা প্রতিধ্বনিও শর্মিষ্ঠায় বহু স্থানে রহিয়াছে।[৫৪]

শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী মধুসূদন মহাভারতের আদিপর্ব হইতে লইয়াছিলেন।[৫৫]

Scanned with CamScanner

শর্মিষ্ঠা নাটকের বীজ সখী-সপত্নীর সৌভাগ্যে ঈর্ষা। পদ্মাবতী নাটকের (খ্রি-স ১২৭২) বীজ সুন্দরী নারীর স্বাভাবিক ঈর্ষা। গ্রীক-পুরাণের একটি আখ্যায়িকা অবলম্বনে পদ্মাবতী নাটকের পরিকল্পনা। কাহিনীটি বলি। জেউসের কন্যা থেতিসের সহিত পেলেউসের বিবাহের সময়ে ঈর্ষাদেবী এরিস একটি সোনার আপেল পাঠাইয়া দেয়। তাহাতে লেখা ছিল, শ্রেষ্ঠ যে সুন্দরী সেই সেটি পাইবে। শ্রেষ্ঠ-সুন্দরীত্বের মর্যাদা লইয়া হেরা, আথেনে ও আফ্রোদিতে এই ত্রিদেবীর বিবাদ বাধিল। শেষে মধ্যস্থ হইল পারিস, যে ছিল মানবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপুরুষ। হেরা তাহাকে মানবপ্রধান করিয়া দিবে, বলিল। আথেনে প্রলোভন দেখাইল সর্বদা যুদ্ধজয়ী করিবার। আফ্রোদিতে বলিল, যে তাহাকে ফলটি দিবে সে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী নারীকে পত্নীরূপে পাইবে। পারিস আফ্রোদিতেকেই আপেলটি দিল এবং পুরস্কার রূপে হেলেনকে বিবাহ করিল। মধুসূদনের কাহিনী বলি। বিদর্ভের রাজা ইন্দ্রনীল একদা মৃগয়া-উপলক্ষ্যে বিন্ধ্যগিরিস্থিত দেব-উপবনে গিয়াছিল। সেখানে ইন্দ্র-পত্নী শচী, কাম-পত্নী রতি এবং কুবের-ভার্যা মুরজা এই তিন দেবসখী বেড়াইতেছিল। তাহাদের দেখিয়া বিবাদ বাধাইতে নারদের ইচ্ছা হইল। এই উদ্দেশ্যে নারদ তাহাদের কাছে গিয়া একটি সুবর্ণ পদ্ম রাখিয়া বলিল, তাহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী সেই যেন পদ্মটি নেয়, অন্যথা যে স্পর্শ করিবে সে পাষাণমূর্তি হইয়া সেই উপবনে রহিয়া যাইবে। এই বিচারে নারদ ইন্দ্রনীলকে মধ্যস্থ করিয়া দিল। বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্রনীল রতিকেই শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলিয়া নির্বাচন করায় শচী ও মুরজা তাহার শত্রু হইল। রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিল,—মাহেশ্বরী পুরীর রাজকন্যা অপূর্ব সুন্দরী পদ্মাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইবে। দুইজনের মধ্যে অনুরাগ জমাইবার জন্য রতি একজনের মূর্তি ধরিয়া অপরকে দেখা দিতে লাগিল। শেষে একদিন পদ্মাবতীকে ইন্দ্রনীলের চিত্রপট দেখাইয়া তাহার পরিচয় দিল। ইন্দ্রনীল বণিক্‌বেশে বয়স্যের সঙ্গে যখন মাহেশ্বরী পুরীতে আসিয়াছে তখন সেখানে রাজকন্যারও স্বয়ংবরসভা আহূত। ইন্দ্রনীলের সঙ্গে দৈবক্রমে পদ্মাবতীর সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাহাকে সামান্য বণিক্ ভাবিয়া পদ্মাবতী দুঃখিত হইল। তাহার অসুস্থতায় স্বয়ংবরসভা ভাঙ্গিয়া গেল। অবশেষে বয়স্যের অনবধানতায় মাহেশ্বরী পুরীতে ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় জানা গেলে

Scanned with CamScanner

পরে পদ্মাবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। রতির বাসনা পূর্ণ দেখিয়া শচী পদ্মাবতীর অনিষ্টচেষ্টা করিয়া ইন্দ্রনীলকে জব্দ করিবার ফিকিরে রহিল। স্বয়ংবরে সমাগত ব্যর্থকাম রাজারা অপমানিত বোধ করিয়া যুদ্ধার্থে সমবেত হইল। ইন্দ্রনীল যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত তখন শচীর প্ররোচনায় কলি রাজসারথির ছদ্মবেশে পদ্মাবতী ও তাহার সহচরীকে হরণ করিয়া এক পর্বতশিখরে গহনকাননে রাখিয়া আসিল এবং কিছুকাল পরে আহত যোদ্ধার বেশে আসিয়া পদ্মাবতীকে বলিল যে ইন্দ্রনীল যুদ্ধে মারা পড়িয়াছে। শুনিয়া পদ্মাবতী মূর্ছা গেল। তখন কাঠুরিয়া-নারীর বেশে রতি আসিয়া পদ্মাবতী ও তাঁহার সখীকে তপস্বীদের আশ্রমে লইয়া গেল। এদিকে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইন্দ্রনীল রাজধানীতে ফিরিয়া পদ্মাবতীকে না দেখিয়া অত্যন্ত কাতর হইল। ইতিমধ্যে মুরজা জানিতে পারিয়াছে যে পদ্মাবতী তাহার শাপভ্রষ্টা কন্যা বিজয়া। রতির মুখে শিবভক্ত ইন্দ্রনীল রায়ের লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া পার্বতী শচীর উপর বিরক্ত হইয়াছেন,—নারদের মুখে এই কথা শুনিয়া শচী রাজার অনিষ্টচেষ্টা ত্যাগ করিল। পরিশেষে তমসানদীতীরে মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে ইন্দ্রনীল-পদ্মাবতীর মিলন ঘটিল।

কাহিনীতে রূপকথার ছাপ অস্পষ্ট নয়, বিশেষ করিয়া অনুরাগসঞ্চারে এবং নায়িকার অপহরণে। নাট্য-পরিকল্পনায় সংস্কৃত নাটকের আদর্শই গৃহীত। বিদূষক মানবক সংস্কৃত নাটক হইতে আমদানি। স্বপ্ন ও চিত্রপট দর্শনে অনুরাগও তাই। রাজাকে প্রথম দেখিয়া পদ্মাবতীর উক্তি—"সখি, দেখ, দেখ এই নূতন তৃণাঙ্কুর আমার পায়ে বাজ্‌তে লাগলো! উহু, আমি ত আর চলতে পারি না, তোমরা একজন আমাকে ধর। (রাজার প্রতি লজ্জা এবং অনুরাগ সহকারে দৃষ্টিপাত)"—শকুন্তলার অনুকরণ। পঞ্চম অঙ্কে প্রথম গর্ভাঙ্কের দৃশ্য "শক্রবতারাভ্যন্তরে—শচীতীর্থ", এবং তপস্বী গৌতমী ও ঋষিবালক শার্ঙ্গধর শকুন্তলা হইতে নেওয়া। নাটকের উপসংহারও শকুন্তলার মতো।

Scanned with CamScanner

কেশব গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি হইতে জানা যায় যে, 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিতে একমাস মাত্র লাগিয়াছিল (৬ আগস্ট হইতে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৬০)। কবে প্রথম ছাপানো হইয়াছিল জানি না। ১২৭২ সালে (১৮৬৫) ছাপা বইয়ে সংস্করণের উল্লেখ নাই, তাই এটিকেই প্রথম সংস্করণ বলিতে হয়। তবে ইহার আগেও বইটি ছাপা হইয়াছিল,[৬৯] মনে হয় বিক্রয়ার্থ নয়। কৃষ্ণকুমারী-নাটকের মূলকথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের প্রতি নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি। জয়পুরের রাজা জয়সিংহকে উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণের লোভ দেখাইয়া চাটুকার ধনদাস নিজের দুইটি স্বার্থ সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে, অর্থলাভ এবং রাজার অনুরক্ত গণিকা বিলাসবতীর আধিপত্যনাশ। বিলাসবতীর সখী মদনিকা ধনদাসের চাতুরি বুঝিয়া কৌশলে মরুদেশের রাজা মানসিংহকে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থিরূপে উপস্থিত করায় এবং মানসিংহের প্রতিকৃতি বলিয়া এক চিত্রপট দেখাইয়া কৃষ্ণকুমারীকে মানসিংহের অনুরক্ত করিয়া তোলে। উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহ স্বদেশরক্ষার্থে বারবার যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়া

Scanned with CamScanner

বলহীন এবং মহারাষ্ট্রশক্তিকে ঘুষ দিয়া থামাইতে গিয়া অর্থহীন হইয়াছে। এই অবস্থায় জয়সিংহ অথবা মানসিংহ কাহারো বৈর সহ্য করিবার মতো শক্তি ভীমসিংহের ছিল না। ভীমসিংহের ইচ্ছা জয়সিংহের সহিত কৃষ্ণকুমারীর বিবাহ হয়, কেননা সে পাত্র হিসাবে উপযুক্ত এবং পাণিপ্রার্থীদের মধ্যেও প্রথম। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মন পড়িয়াছে মানসিংহের উপর এবং রাজমহিষীর ইচ্ছাও তাহাই। তাহার উপর মহারাষ্ট্রপতি মানসিংহের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন উপায় কৃষ্ণকুমারীর নাই, মরণ ছাড়া। মন্ত্রী রাজাকে সেই কথা বলিল। এই নিদারুণ কাজের ভার পড়িল রাজভ্রাতা সেনাপতি বলেন্দ্রসিংহের উপর। বলেন্দ্রসিংহ হত্যা করিতে গিয়াও পারিয়া উঠিল না। কৃষ্ণকুমারী আত্মহত্যা করিয়া পিতৃব্যের কঠিন কর্তব্য সম্পন্ন করিল।

ইতিহাস অবলম্বনে বাঙ্গালায় নাটক এই-ই প্রথম। কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী টডের রাজস্থান-ইতিবৃত্ত হইতে গৃহীত। ১৭৭৯ শকাব্দের পৌষ সংখ্যা বিবিধার্থসংগ্রহে প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারী ইতিহাস' প্রবন্ধও মধুসূদন দেখিয়া থাকিবেন। ইতিহাস-কাহিনীর সহিত নাটক-কাহিনীর সম্পর্ক ক্ষীণ। তাই কৃষ্ণকুমারীকে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে না।

কৃষ্ণকুমারী পূর্ববর্তী বাঙ্গালা নাট্যরচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী অধিকাংশ নাটকের তুলনায়ও ভালো। প্লট নাট্যোপযোগী এবং দ্রুতগতি, পরিণতি স্বাভাবিক, অসংলগ্নতা নাই। মধুসূদনের অপর দুই নাটকের মতো রোমান্সপ্রধান নয়। মানবীয়তার প্রাধান্যহেতু নাটকে কিছু বাস্তবতা আসিয়াছে। ইহার পূর্বে দুই একখানি বিয়োগান্ত "নাটক" লেখা হইলেও কৃষ্ণকুমারী-নাটককেই বাঙ্গালায় প্রথম ট্রাজেডি বলা চলে। কৃষ্ণকুমারীর ভাগ্যচক্র গ্রীক ট্রাজেডির অপরিহার্য নিয়তির মতো সমগ্র নাটকটির উপর চাপিয়া আছে। এউরিপিদেস্-এর 'ইফিগেনিয়া' *(Iphigeneia he en Āulidi)* নাটকের ক্ষীণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কৃষ্ণকুমারীর বলিদানে। কোন ভূমিকাই পরিস্ফুট নয়, এবং সংলাপের ভাষা নাটকোচিত নয়। দুর্দৈবগ্রস্ত রাজ্যচিন্তাকুল প্রবীণ ভীমসিংহ যথেষ্ট স্বাভাবিক। অত্যন্ত অপরিস্ফুট হইলেও জয়সিংহের ভূমিকা অস্বাভাবিক নয়। ধনদাস খাঁটি পষণ্ড, যদিও তাহার উপর সংস্কৃত নাটকের বিদূষকের ছায়া কিছু পড়িয়াছে। নারী-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদনিকা। ধনদাসের নিগ্রহের পর তাহার প্রতি অনুকম্পা এই নারীর ভূমিকাটিকে উজ্জ্বল করিয়াছে।[৭০] বিলাসবতী মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার অনুকরণ, তবুও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। স্বগত-উক্তির বাহুল্যে কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকার কিছু স্বাভাবিকতা কমিয়াছে। গ্রীক নাট্যের অনুকরণে অশরীরী পদ্মিনীর আবির্ভাব নাট্যরসকে তরল করিয়াছে.। অপ্রধান ভূমিকাগুলিতে স্বাভাবিকতা অসুলভ নয়। তপস্বিনী কপালকুণ্ডলা ভবভূতির মালতীমাধব নাটককে স্মরণ করায়। নায়িকা কৃষ্ণকুমারী একেবারে ব্যর্থ সৃষ্টি।

কৃষ্ণকুমারী-নাটক সম্পূর্ণভাবে গদ্যে লেখা। ভাষা পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সহজ হইলেও নাটকের উপযোগী নয়। পাঁচটি গান আছে। গানগুলির রচয়িতা সম্বন্ধে সংশয় আছে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর মতে গানগুলি যতীন্দ্রমোহনের রচনা, নগেন্দ্রনাথ সোমের মতে দুইটি মাত্র যতীন্দ্রমোহনের রচনা।

মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ কৃষ্ণকুমারী-নাটকে। ভীমসিংহের খেদে আমরা যেন সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কথা শুনি।

Scanned with CamScanner

(দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া) ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হলো, আমরা যে মনুষ্য, কোনমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না। জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্টবারি নদীতে প্রবেশ কর্য়ে তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখনও অব্যাহতি পাবো?

মধুসূদন অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই নাটক লিখিতেন। তাই রচনা শেষ হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয়ার্থ ছাপানো হইত না। মধুসূদনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে কৃষ্ণকুমারী বেলগেছে থিয়েটারে অভিনীত হয়। কৃষ্ণকুমারীর পর তিনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন যে মুসলমান ভূমিকা লইয়া 'রিজিয়া' নাটক লিখিবেন। মাদ্রাজে থাকিতে এই নামে তিনি একটি ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য লিখিয়াছিলেন। এক চিঠিতে (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬০) মধুসূদন লিখিতেছেন,

> We ought to take up Indo-Mussulman subjects. The Mahommedans are a fiercer race than ourselves, and would afford splendid opportunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours... After this, we must look to "Rizia". I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up.[৭১]

প্রহসন দুইটি বেলগেছে থিয়েটারে অভিনীত না হওয়ায় মধুসূদনের মনোভঙ্গ হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারীরও সেই দশা ঘটিলে নাটকরচনা ছাড়িয়া দিবেন এই ভয় দেখাইয়া তিনি কেশবচন্দ্রকে পরবর্তী পত্রে লিখিতেছেন,

> Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and Chinese![৭২]

পাইকপাড়ার রাজাদের ঔদাসীন্য দেখিয়াও মধুসূদন আশা ছাড়েন নাই, ভাবিয়াছিলেন হয়ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কৃষ্ণকুমারী অভিনয় করাইবেন। সে আশাও যখন পূর্ণ হইল না তখন মধুসূদন নাটকরচনা ছাড়িয়া দিলেন।

মধুসূদনের নাট্যরচনা পাঁচখানি,—তিনখানি নাটক ও দুইখানি প্রহসন—দুই বছরের মধ্যে লেখা। চতুর্থ নাটক 'মায়া-কানন' যখন লেখা হয় তখন মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্তি ভস্মাবশেষ। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই মধুসূদনকে মায়া-কানন রচনা করিতে হয়। রচনা মোটামুটি শেষ করিয়া গিয়াছিলেন, তবে অপরের সংযোজন বেশ ছিল এবং সেই কারণে সংশোধনের আবশ্যকতা খুবই ছিল। সুতরাং ইহাতে রচনার উৎকর্ষ থাকিবার কথা নয়। তবুও সমালোচকেরা মায়া-কাননকে যতটা অনাদর করেন ততটা নায্য নয়। আর কিছু না হোক, মধুসূদনের শেষজীবনের অনির্বাণ আত্মগ্লানিবহ্নির শুদ্ধিলব্ধ বলিয়াই মায়া-কাননের প্রধান ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য।

Scanned with CamScanner

শর্মিষ্ঠা-নাটক লিখিবার অব্যবহিত পরে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। এই দুইখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যরচনার অন্যতম। ইহাতে সমসাময়িক দুই-পুরুষের চরিত্রগত সাধারণ দুর্বলতার চিত্র আঁকা। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র বিষয় নবলব্ধ ইংরেজী-শিক্ষাভিমানী যুবকদের প্রকাশ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার, আর 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র বিষয় ধর্মকঞ্চুকাবৃত বৃদ্ধদের গোপন লাম্পট্য। একেই-কি-বলে-সভ্যতায় মধুসূদন প্রকারান্তরে নিজের দলকেই (হিন্দু কলেজীয় ?) তিরস্কার করিয়াছেন। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার সভ্যদের আদর্শ হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র অনুকরণে কল্পিত বলিয়াই মনে হয়। জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার প্রকাশ্য আদর্শ জাহির হইয়াছে কালীবাবুর কথায়।

> আজ্ঞে, আমাদের কলেজে থেকে কেবল ইংরেজি চর্চা হয়েছিল, তা আমাদের জাতীয় ভাষা তো কিঞ্চিৎ জানা চাই, তাই এই সভাটি সংস্কৃতবিদ্যা আলোচনার জন্যে সংস্থাপন করেছি। আমরা প্রতি শনিবার এই সভায় একত্র হয়ে ধর্মশাস্ত্রের আন্দোলন করি।

কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, সেকালের সংস্কারবাগীশ ইংরেজীনবীশের প্রকৃত মনোভাব, বাহির হইয়া পড়িয়াছে নববাবুর বক্তৃতায়।

> জেন্টেলমেন, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা, এই গৃহ কেবল আমাদের লিবারটী হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান। এখানে যার যে খুসী সে তাই কর। জেন্টেলমেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রীডম, লেট অস্ এঞ্জয় আওরসেলভস্।

লেখকের ভাষ্য, সর্বশেষে হরকামিনীর খেদোক্তি।

> বেহায়ারা আবার বলে কি যে আমরা সায়েবদের মতো সভ্য হয়েচি।

এই প্রহসনে মধুসূদন সংস্কৃত-কলেজীয়দের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন।

Scanned with CamScanner

একেই-কি-বলে-সভ্যতায় কাহিনী বলিতে কিছু নাই। কিন্তু বুড়- সালিকের- ঘাড়ে-রোঁয়[৭৩] ঠিক তা নয়। দুর্নিবার লাম্পট্যের তাড়নায় এক মুসলমান চাষার ও এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কাছে প্রবীণ জমিদার ভক্তপ্রসাদবাবুর লাঞ্ছনা ইহার বিষয়। প্রহসনটি জানা-শোনা ঘটনা অবলম্বনে পরিকল্পিত বলিয়া মনে হয়। ভক্তপ্রসাদের ভূমিকা উজ্জ্বলভাবে স্বাভাবিক। অর্থলোভ, কৃপণতা এবং লাম্পট্য নায়কের মনে যে বিচিত্র দ্বিধা-তরঙ্গ তুলিয়াছিল তাহা ভূমিকাটিতে বেশ প্রতিফলিত হইয়াছে। গদাধর খানসামা হানিফের যুবতী স্ত্রীর প্রতি ভক্তপ্রসাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে ভক্তপ্রসাদ চিন্তায় পড়িল।

মুসলমান ? যবন ? ম্লেচ্ছ ? পরকালটাও কি নষ্ট করবো ?

গদা নজির দিল

আপনি না আমাকে কতবার বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের মেয়েদের নিয়ে কেলি কত্যেন !

ভক্তপ্রসাদ তখন ভরসা পাইল।

দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি ? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতি স্বরূপা, এমন তো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্চে।

তাহার পর গদা যখন টাকার কথা তুলিল তখন কিন্তু ভক্তপ্রসাদ চমকাইয়া উঠিল,

কুড়ি-টাকা ! বলিস কি ?

ভক্তপ্রসাদবাবু ইংরেজী জানিত না এবং ইংরেজী শিক্ষা ও সামাজিক উদারতার প্রতি অত্যন্ত বিমুখ ছিল। কথার পিঠে "ক্লেবর" শুনিয়া ভক্তপ্রসাদ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল।

ও সকল বাপু আমাদের কাণে ভাল লাগে না। জহীন্ কিম্বা চালাক বললে আমরা বুঝতে পারি।

পুত্র অম্বিকাপ্রসাদকে সে কলিকাতায় ইংরেজী পড়াইতে পাঠাইয়াছে কিন্তু সর্বদাই ভাবনা কোনদিন বা ছেলে অধর্মাচরণ করিয়া বসে। ভক্তপ্রসাদের মতে অধর্মাচরণ হইতেছে,—"এই দেব-ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানি মত" এবং সকল জাতির লোকের একত্র পংক্তি-ভোজন ইত্যাদি। শিবমন্দিরে অনাচার করিতে তাহার ধর্মে বাধে না, কেননা "তা ভগ্নশিবে তো শিবত্ব নাই, তার ব্যবস্থাও নিয়েছি।"

প্রহসন-দুইটির ভাষা সহজ সরস বিশুদ্ধ কথ্যভাষা। জ্ঞানতরঙ্গিণী-সভার সভ্যবাবুদের কথায় বারো আনা ইংরেজী বুকনি। বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁয় শুধু দুই জায়গায় ভক্তপ্রসাদের উক্তিতে পৌরাণিক উপমা পাওয়া গিয়াছে।

ধনঞ্জয় অষ্টাদশ দিনে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমরে বধ করেন—আমি কি আর এক মাসে একটা তেলীর মেয়েকে বশ করত্যে পার্‌বো না !

এমন কনক-পদ্মটি তুলতে পাল্লেম্ না হে। সসাগরা পৃথিবীকে জয় করে পার্থ কি অবশেষে প্রমীলার হস্তে পরাভূত হলেন।

সাধারণ কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে এইভাবে রামায়ণ-মহাভারতের উপমা ব্যবহার মধুসূদনের সহজসিদ্ধ ছিল। "অত্যন্ত সাধারণ কথাবার্তায় মাইকেল মহাভারত রামায়ণ হইতে এমন সুন্দর উপমা হঠাৎ আনিয়া ফেলিতেন যে শ্রোতৃবৃন্দ অবাক হইয়া যাইত।"[৭৪] ফ্রান্স হইতে বিদ্যাসাগরকে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন,

Scanned with CamScanner

আপনি এখন অভিমন্যুর মত মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব-দলে প্রবেশ করিয়াছেন, আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি ; অতএব আপনাকে স্ব-বলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক ॥

(পার্থের সঙ্গে প্রমীলার উপমা-সংযোগ ভুল। অভিমন্যু কৌরবব্যূহ ভেদ করিয়া ফিরিতে পারে নাই। মধুসূদন নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তামাসা করেন নাই।)

বুড়-সালিকের-ঘাড়ে-রোঁ লিখিয়া মধুসূদন সেকালের কলকাতার বাঙ্গালী সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী (কায়স্থ ?) দলগুলিকে চটাইয়াছিলেন। তাই এই চমৎকার প্রহসনটি অভিনীত হইবার সুযোগ পায় নাই। যাঁহারা একেই-কি-বলে-সভ্যতা পড়িয়া নব্য সমাজের গ্লানিচিত্রদর্শনে উল্লসিত হইয়াছিলেন তাঁহারা এখন নিজেদের নিখুঁত ছবি দেখিয়া হতবাক্ হইলেন। নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীনপন্থী দুই দলকেই ঘাঁটাইবার ফলে মধুসূদনকে বেশ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালা প্রহসনের আদর্শ ধরিয়া মধুসূদনের বই-দুইটিকে নিখুঁত বলা চলে। সরসতা সূক্ষ্ম এবং উঁচুদরের না হইলেও বাস্তব ও মানবীয় বলিয়া কার্যকর ও সফল হইয়াছে। পরবর্তী প্রায় সকল প্রহসন এবং কোন কোন নাটক মধুসূদনের প্রহসনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। এই প্রহসন-দুইটিতে মধুসূদন আগাগোড়া দেশি সামগ্রী লইয়া কারবার করিয়াছেন। এখনকার দিনের সংবাদপত্রীয় সমালোচনার ভাষায় (তখনকার ডি. গুপ্তের টনিকের বিধি "জীবিত মংস্যের ঝোল'-এর মতো) বই দুইটি "খাঁটি বাঙ্গালা সাহিত্য।" প্রহসন দুইটির নামকরণে মধুসূদন অভিনবত্ব দেখাইলেন একটি বা দুইটি শব্দ ব্যবহার না করিয়া প্রবচন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাক্য) ব্যবহার করিয়া।

রামনারায়ণের রত্নাবলী, নিজের শর্মিষ্ঠা এবং দীনবন্ধুর নীলদর্পণ—এই তিনখানি নাটক মধুসূদন ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। উমেশচন্দ্রের বিধবাবিবাহ নাটকেরও অনুবাদ করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল ॥

Scanned with CamScanner